২৬ মার্চ

মহান স্বাধীনতা

ও জাতীয় দিবস

২০২৬

স্বাধীনতা

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪৩২
২৬ মার্চ ২০২৬

বাণী

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

স্বাধীনতা জাতি হিসেবে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। আজকের এই দিনে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিত মা-বোন, মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সংগঠক ও সর্বস্তরের জনগণকে-যাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য ও তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসামান্য আত্মত্যাগ আমাদেরকে একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার পথে দৃপ্ত পদভারে এগিয়ে চলার সাহস যোগায়। স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শোষণমুক্ত সমাজ ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সর্বস্তরের জনগণের ক্ষমতায়নকে সুসংহত করা। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সাম্য, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে স্বাধীনতার অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূরণ করতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী-সমৃদ্ধ মানবিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

দীর্ঘদিনের অপশাসন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত জ্বালানি পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব দেশ ও দশের ওপর পড়ছে। সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে একটি স্বনির্ভর, গতিশীল ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে। এসময় দৃঢ় জাতীয় ঐক্য, সহমর্মিতা ও দেশপ্রেম খুব জরুরি।

আমি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি ইনসাফভিত্তিক, স্বনির্ভর, নিরাপদ ও কর্মমুখর বাংলাদেশ বিনির্মাণে দল-মত-পথ নির্বিশেষে দেশবাসীকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মহান স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার

প্রফেসর ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

স্বাধীনতা আমাদের শত জনমের সাধনার ফল। ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The social contract এ বলেছেন, 'man is born free, but everywhere he is in chain.' অর্থাৎ মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পরবর্তীতে সে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। এই শৃঙ্খল ভাঙ্গার নামই স্বাধীনতা। মানুষতো বটেই সৃষ্টি জগতের কোনো প্রাণীই পরাধীন হয়ে বাঁচতে চায় না। যারা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, একমাত্র তারাই জানে স্বাধীনতার কী মর্ম, স্বাধীনতার কী আনন্দ। প্রতিটি মানুষই স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু স্বাধীনতা এমন এক বিষয় যা চাইলেই পাওয়া যায় না। এ জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে যারা যুগের পর যুগ চেষ্টা করেও নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। এক সময় বাঙালিদের ভীতু বলে উপহাস করা হতো। কিন্তু সময়ের আবর্তে বাংলাদেশের মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে তারা ভীতু তো নয়ই বরং বীরের জাতি। সময়ের সাহসী সন্তান বাংলার মানুষ স্বাধীনতা প্রিয় এবং স্বাধীনতার জন্য তারা মূল্য দিতে জানে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশ ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি জনপদ। এদেশের মাটিতে সোনা ফলতো। বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল। কথায় বলে, 'আপন মাংসে হরিণা বৈরি।' অর্থাৎ হরিণ তার সুস্বাদু এবং উপাদেয় মাংসের জন্য বারবার শিকারির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। বাংলার অবস্থাও ছিল ঠিক তেমনি। সম্পদের প্রাচুর্য বারবার শত্রুদের প্রলোভিত করেছে বাংলা দখল করার জন্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য বহিরাগতদের বাংলাদেশে আসতে উৎসাহিত করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী পর্যটক ফাঁসোয়া বার্ণিয়ারের মতে, বাংলায় প্রবেশের শত পথ উন্মুক্ত, কিন্তু বেরোবার কোনো দরজা খোলা নাই। (There are hundred gates open to enter bengal, but there is not a single gate to come out of it). এর অর্থ হলো বাংলার প্রাচুর্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কোনো মানুষকে এতটাই আকৃষ্ঠ করে যে সেখানে সে সানন্দে গমন করবে, কিন্তু সেখান থেকে আর বেরুতে চাইবে না। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সে প্রাচুর্য এবং সৌন্দর্য অনেকাংশে হারিয়ে গেলেও, দখলদার বাহিনী বারবার বাংলাকে আক্রমণ এবং বাংলার মসনদ দখল করেছে।

বাংলার মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ থাকে তখন তারা যে কোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে। 'ঐক্যই শক্তি, বিভক্তিই ধ্বংস'---এই বক্তব্যের সত্যতা আমরা বারবার উপলব্ধি করেছি। বাংলার মানুষ যখন হীন স্বার্থে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তখন তারা বিদেশি শক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে। আবার যখন তারা ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের বিজয় কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল বলেই তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিকট থেকে বাংলাদেশের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

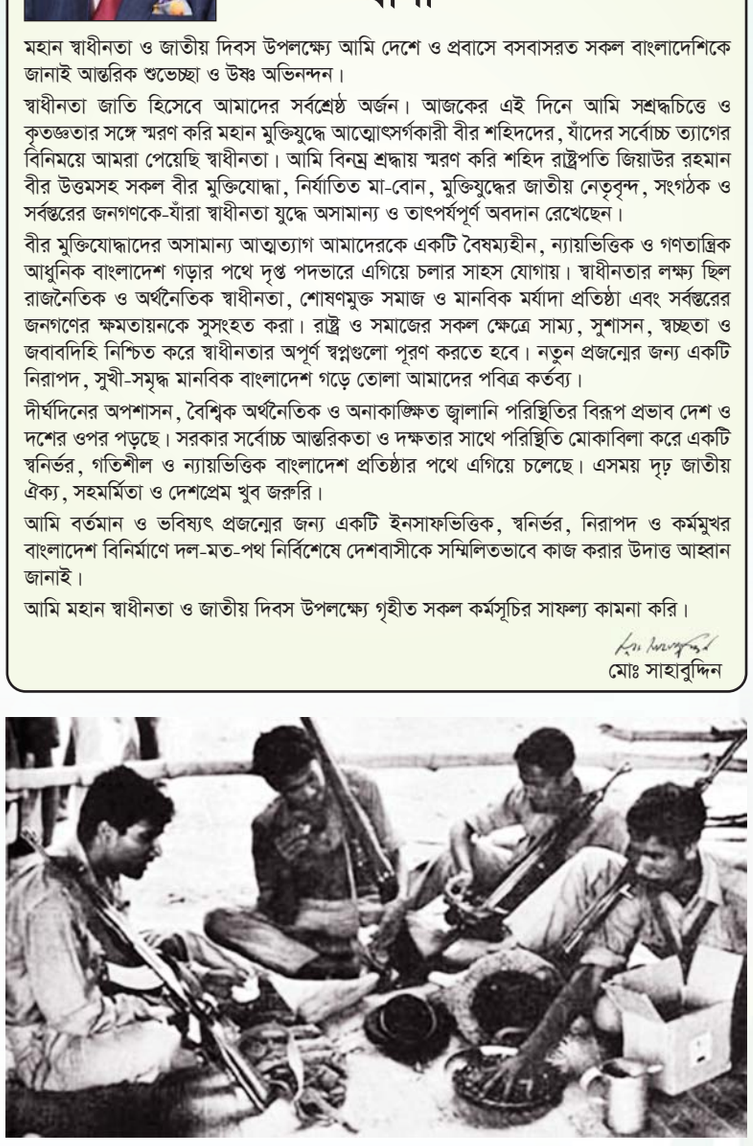

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪৩২
২৬ মার্চ ২০২৬

বাণী

আজ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণসহ প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

২৬ মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনের এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতির শ্রেষ্ঠ সূর্যসন্তানদের, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। একই সঙ্গে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিতা মা, বোন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিবেদিত সকলকে গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি এবং সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

মহান স্বাধীনতা দিবস আমাদের জীবনে সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের চেতনাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারাকে আরও বেগবান করতে জাতীয় ঐক্য, পারস্পরিক সহনশীলতা এবং দেশপ্রেমের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

আসুন, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের তাৎপর্য থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করি। একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করি।

আমি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

তারেক রহমান

মহান শহিদদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে

মাহ্‌বুব উল্লাহ্

আজ ২৬ মার্চ। বাংলাদেশের ৫৬তম স্বাধীনতা দিবস। একটি দেশের ইতিহাসে ৫৬ বছর খুব কম সময় নয়। এই ৫৬ বছরে আমাদের অনেক কিছু অর্জন করার কথা ছিল। কিন্তু এ কথা মানতেই হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের যেমন অনেক অর্জন আছে, তেমনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়েছি। স্বাধীনতার ৫৬ বছরে আমরা স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি, খুঁজছি সার্বভৌমত্ব, খুঁজছি গণতন্ত্র, খুঁজছি সার্বজনীন মানবাধিকার, খুঁজছি একটি বৈষম্যহীন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা। আমরা যদি নিজের কাছে প্রশ্ন করি আমাদের এই চাওয়াগুলোর কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি? এর জবাব হলো আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তবে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ বিবেকের দ্বারা তাড়িত হয়ে দেশ ও জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করি তাহলে দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলা যায় আমরা আমাদের অভিপ্সিত লক্ষ্যে অবশ্যই পৌছাতে পারব। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমাদের প্রত্যেকটি নাগরিককে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে।

২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। কিন্তু এই দিনে আমরা পাক হানাদার বাহিনীকে আমাদের দেশের মাটি থেকে উৎখাত করতে পারেনি বরং, ২৫ ও ২৬ মার্চের শেষ ও প্রথম প্রহরের লগ্নে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপর হিংস্র হায়নার মতো ঝাপিয়ে পড়েছিল। তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, খেটে খাওয়া মানুষ, রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়িওয়ালা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলো। অথচ ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আত্মত্যাগ ও লড়াই ছিল অগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রবল বঞ্চণার শিকার হলো। কী শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে, কী অর্থনৈতিক প্রশ্নে, কী রাজনৈতিক প্রশ্নে এবং সর্বোপরি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে পাঞ্জাবভিত্তিক পাকিস্তানের সামন্ত-পুঁজিবাদী ও সামরিক- বেসামরিক আমলাচক্র আমাদেরকে সবদিক থেকে হীনবল করতে এবং আমাদের অধিকারগুলো কেড়ে নিতে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে থাকলেও তারা সংখ্যানুপাতিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে চায় নি। এসব কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। ছয় দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এবং ১১ দফা ভিত্তিক গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানের দাবিতে যে আন্দোলন সংগ্রাম হয়েছে তা তারা সহিংসভাবে দমন করার প্রয়াস পেয়েছে। পাকিস্তানের শাসকরা ১৯৫২ সালে মায়ের ভাষায় কথা বলার দাবিকে নিস্তব্ধ করতে গিয়ে ছাত্রজনতাকে হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে দিনে দিনে বেড়েছে ক্ষোভ, বেড়েছে বঞ্চণাবোধ। অবশেষে ১৯৭০ সালে সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে সমগ্র পাকিস্তানভিত্তিক একটি নির্বাচন হলো। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তৎকালীন ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। নানা চক্রান্ত ও অপকর্মে লিপ্ত হয়। সবশেষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবির ন্যায্যতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সামরিক অভিযান চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বাংলাদেশের জনগণ দেখল ১৯৪৭ সালে যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৭১ সালে এসে সেই বন্ধনের লেশ মাত্র নেই। পরিবর্তে এদেশের মানুষ পেল হত্যা, আগুন ও ধর্ষণের বর্বরতা। এভাবেই ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর প্রথম প্রহরে ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধন যা রাষ্ট্রীয়ভাবে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে যুক্ত হয়েছিল তা ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা কিন্তু তখন ওদের শাসন থেকে মুক্ত ছিলাম না। তবুও চেতনার জগতে আমরা হয়ে দাঁড়ালাম ভিন্ন, স্বাধিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম আমরা কখনো আর পাকিস্তানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকব না। সেজন্য ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। অন্তরের দিক থেকে আমাদের আর কোনো দায় থাকল না তাদের প্রতি।

২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যাযজ্ঞ শুরু হলে এদেশের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। সেই মুহূর্তে তাদের সামনে সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা ছিল না। ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যে কাজটি করার দায়িত্ব ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের, সে কাজটি করার দায়িত্ব চরম ঝুঁকি নিয়ে নিজ কাঁধে তুলে নিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। দেশবাসী তার স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেছে। হতবিহ্বল জাতি সেই ঘোষণায় উদ্দীপ্ত হয়ে আশার আলো দেখতে পেল। তারা জানতে পারল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছে এবং এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে বাঙালি সৈনিক, ইপিআর ও পুলিশ। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলো। দীর্ঘ নয় মাস এদেশের শত সহস্র মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই করে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। তখন ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। মাত্র তিন থেকে চার সপ্তাহে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যখন পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ দলিলে পাকিস্তানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন লেফটেনেন্ট জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি। অতীব দুঃখ বেদনার বিষয় সেই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম আতাউল গনি ওসমানী উপস্থিত থাকতে পারেননি অথবা উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় নি। যে দেশের মানুষ লড়াই করে রক্ত দিয়ে বিজয় নিশ্চিত করেছে সে দেশের মুক্তিবাহিনীর প্রধান আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকায় বিজয়ের গৌরব অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। ম্লান হয়ে যায় আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবটি অসমাপ্ত থেকে যায়। জেনারেল ওসমানী যে হেলিকপ্টারে করে আসছিলেন সেই হেলিকপ্টারটি রহস্যজনকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে গেল আমাদের মহান বিজয়ের গৌরব।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সুদূর প্রসারিত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে আমাদের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিল। তারপর ধাপে ধাপে বিভিন্ন লড়াই ও সংগ্রাম হয়েছে। ১৮৫৭ সালে সংগঠিত হয়েছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বাঙালি সিপাহি মঙ্গল পান্ডে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হন। একে একে গড়ে উঠেছিল সৈয়দ আহমদ বেরলভির নেতৃত্বে আজাদির লড়াই। নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষকদের লড়াই, শহিদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লার লড়াই, ফকির মজনু শাহের লড়াই, পাবনার পোল বিদ্রোহ, ফরায়েজি আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজ তলোয়ারে নৌ-বিদ্রোহ, আজাদি হিন্দ ফৌজের সমরনায়কদের বিচারের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান, ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ভূমিধস বিজয়, ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালে ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন এবং পরিশেষে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে নানা চড়াই-উতরায় এবং ইতিহাসের পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় আবাসভূমি বাংলাদেশ। পেয়েছি জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে ২৬ মার্চ। নিঃসন্দেহে এই দিনটি আমাদের জন্য গৌরব ও অহংকারের, এই দিনে আমরা শপথ গ্রহণ করব আগামী দিনে আমাদের অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করার। তাতেই সম্ভব হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশ হবে ১৮ কোটি জনতার শান্তির নীড়। কীভাবে বাংলাদেশকে ১৮ কোটি জনতার জন্য একটি শান্তির নীড়ে আমরা পরিণত করতে পারবো? সেজন্য আমাদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশ উত্তরকালে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে, আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে মাথাপিছু আয়। তা সত্ত্বেও এই অর্জন সন্তোষজনক নয়। দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে আশাব্যঞ্জকহারে হ্রাস পেলেও ২০২১ সালের পরে দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এখন দেশের চার কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। স্বাভাবিকভাবে

দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন ও কৃষির বিকাশ ও রূপান্তর। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের জিডিপির মাত্র ২২-২৩ শতাংশ বার্ষিক বিনিয়োগ হয়, কিন্তু উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করতে হলে প্রয়োজন হবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। যুগপৎ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, কিন্তু অসম্ভব নয়। আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে তা থেকে গেছে খুবই একপেশে। আমাদের শিল্পখাতে রয়েছে পোশাক শিল্পের প্রাধান্য। এই শিল্পটিও ঝুঁকিমুক্ত নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পালটা শুল্ক এই শিল্পের জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে। শোনা যায়, এখন ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারায় পোশাক শিল্পের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়ে দিতে চাইছে। এর ফলে ৪০ লক্ষ শ্রমিকের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের আগ্রাসন আমাদের জন্য জ্বালানি সংকট তীব্রতর করে তুলছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতার সুফল রক্ষা ও তার বিস্তার অত্যন্ত কঠিন। বাংলাদেশে কিছু কিছু শিল্পখাত রয়েছে যেগুলোর প্রতি মনোযোগী হলে আমরা সুঠাম একটি শিল্পখাত গড়ে তুলতে পারি। বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় খাতগুলো হচ্ছে চামড়া শিল্প, ঔষধ শিল্প এবং পাট শিল্প। এসব ছাড়াও ক্ষুদ্র-মাঝারি বহুবিধ শিল্প এদেশে গড়ে উঠতে পারে যদি যথাযথ রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও নীতি সমর্থন প্রদান করা যায়।

বর্তমানে জাতীয়ভাবে আমাদের কর্তব্য হলো শিল্পখাতে বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনয়ন। তবে সেই পথেও বড়ো রকমের বাধা রয়ে গেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে-সব সুবিধা ভোগ করত সেই সুবিধাগুলো হারাবে। এই কারণে ২০২৬ এর স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের শিল্পখাত আরও সম্প্রসারিত ও বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

একটি দেশ কতটা উন্নত হবে তা নির্ভর করে প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় দেশটি কতটুকু উন্নত তার উপর। ১৯৭১ সালে বিজয়ের পর এদেশে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষায় পরিমাণগত যে বিকাশ হয়েছে তার তুলনায় গুণগত অর্জন নেই বললেই চলে। এখন জাতির সামনে সবচাইতে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করা। তার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষক। ভালো শিক্ষক ছাড়া ভালো শিক্ষাব্যবস্থা আশা করা যায় না। দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ফলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক যোগ্যতাহীন শিক্ষকরা আসন গেড়ে বসেছে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এদেরকে বিদায় দেওয়া সহজ নয়। অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ফলে চাকুরির বাজারে যেসব গ্র্যাজুয়েট আসছে তাদের মান কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এরাই আবার স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হচ্ছে। গোটা শিক্ষাব্যবস্থা একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

স্পর্ধা ১৯৭১

হাসান হাফিজ

নির্বিচার গণহত্যা ডেকে আনে গণ প্রতিরোধ।
চতুর্দিকে বেজে ওঠে সর্বাত্মক যুদ্ধের দামামা।
বীর চট্টলায় শুরু বিস্ফোরণ। তারপর দেশব্যাপী।
শুরু হয় জনযুদ্ধ। সর্বাত্মক। আমৃত্যু শপথ। পিছু ফেরা নেই।
জীবন অগ্নিরই নাম। মুক্তিযুদ্ধ, সে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।
লাভাস্রোত উদ্‌গিরণ। জ্বলে ওঠা। একমাত্র সত্য সেই।
অন্য কোনো লক্ষ্য নেই। মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করাই শপথ।
জনযুদ্ধ চারিদিকে। কাদামাটি বদলে গেছে। হয়েছে পাথর ।
গ্রামগঞ্জ শহর বন্দর। সর্বত্রই দুন্দুভি উজ্জ্বল। শুধু প্রতিশোধ।
হানাদার শত্রুকে হটাও। বদলা নাও। দাঁতের বদলে দাঁত।
ফোটাও স্বাধীন ফুল। রক্ত ছাড়া প্রাণ ছাড়া যে ফুল ফোটে না।
ফুটতে সে আদৌ জানে না। দুনিয়ার ইতিহাসে এরকম নেই।
গেরিলা কৌশল সবে শিখে নেয়। ছাত্র যুবা কৃষক শ্রমিক।
অস্ত্র হাতে বীর দর্প। শত্রুনিধনের যজ্ঞ চলতেই থাকে।
বিজয় কতটা দূর? কতো আর রক্ত চাও স্বাধীনতা?
আর কত তিতিক্ষা সম্ভ্রম? আর কত ধ্বংস বিপর্যয়?
আর কত পরীক্ষা ধৈর্যের? দিনে দিনে বাড়ে জেদ। জিগীষাও।
ক্রোধ বহ্নি বদলে যায় শক্তির অমিত তেজে। বিক্রমে বিপুল।

তারপর অবশেষ। ভোর হয়। আঁধার জরায়ু-চেরা দিগন্ত নতুন।
পুবাকাশে সূর্যের উজ্জ্বল ছটা। রৌদ্র, প্রাণ, জয়, মহা জয়।
এই সূর্য রক্ত দিয়ে নিজ বৃত্ত পূরণ করেছে। এমনই নিয়ম।
স্বাধীনতা এসেছে প্রত্যয়ে। অনিবার্য প্রয়োজনে যুদ্ধ হবে ফের।
এই সূর্য কখনোই অস্তমিত হয়নি হবে না। হতেই পারে না।

বুক তার বাংলাদেশ

রেজাউদ্দিন স্টালিন

ইথারে ইথারে বেজে উঠলো দামামা
ঘোষণা হলো মুক্তিযুদ্ধ
বঙ্গোপসাগর থেকে কালুরঘাট
কেঁপে উঠছে আবেগে উচ্ছ্বাসে
অপেক্ষায় অপেক্ষায় উন্মত্ত মানুষ
পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি
আনন্দ ঘাসে ঘাসে

অধীর জনতা ঘোষণা শুনলো মুক্তিযুদ্ধের
মুক্তিযুদ্ধের বার্তা বাহক
কৃষক শ্রমিক আর কুলবধুগণ
প্রত্যেকে জানে তিনি অনুবাদ করবেন
মানুষের স্বপ্নসমূহ

গ্রামে ও নগরে বাজে বাঁশি
তোরণে তোরণে তোপধ্বনি
মসজিদ মন্দির গীর্জায় প্রার্থনা
মুক্তি পাবে সুন্দরবন
মুক্তি পাবে আকাঙ্ক্ষা
মুক্তির গানে ভরে উঠবে দেশ
আমাদের উঠোনে দাওয়ায়
বসবে আড্ডা চা খানায় মাঠে ময়দানে
তার ঘোষণা অভয় মানুষের
প্রশান্তি স্বাস্থ্য ও শুশ্রূষা

স্বাধীনতা প্রিয় মাতৃদেশ
অপার আদর্শ বুকে
তিনি সেনানায়ক
শোনা যায় কণ্ঠস্বর
শোনা যায় প্রার্থিত মুক্তির গান
বিজয়ের আনন্দে
জেগে ওঠে পাড়া
বুক তার বাংলাদেশ সে
দেবে পাহারা

মহান স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার

স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহ্যগতভাবেই শান্তি প্রিয়। তবে নিজ মাতৃভূমির স্বাধীনতার প্রশ্নে তারা অটল। কোনো কিছুর বিনিময়েই তারা স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। বাংলা বারবার বিদেশি শক্তির পদানত হয়েছে। কিন্তু কখনোই দীর্ঘমেয়াদের জন্য পরাজয় মেনে নেয়নি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে গড়ে উঠা ঐক্যই ছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলমন্ত্র। তবে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা স্বপ্ন হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। অথবা আমরা যদি মনে করি, ১৯৭১ সালে

বাংলাদেশ হঠাৎ করেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে তাহলে ভুল হবে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে স্বাধীন পাকিস্তান এবং ভারত নামক রাষ্ট্র গঠিত হয়। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই উপমহাদেশের মুসলমানগণ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক (শেরে বাংলা) ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। মূল লাহোর প্রস্তাবেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন প্রোথিত ছিল। একে ফজলুল হক উত্থাপিত মূল লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সন্নিহিত এলাকায় নিয়ে এক বা একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। কিন্তু পরবর্তীতে ‘প্রিন্টিং মিসটেক’ হিসেবে অভিহিত করে ‘একাধিক রাষ্ট্র’ শব্দের পরিবর্তে ‘একক রাষ্ট্র’ গঠিত হবে শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হয়। ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অঞ্চলে মুসলমানগণ ভেবেছিলেন, ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতে গড়ে উঠা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে তারা হয়তো আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে পারবে। তাই তারা পাকিস্তান আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বৃটিশ শাসকগণ যখন বুঝতে পারে উপমহাদেশের মানুষকে আর দীর্ঘ দিন তাদের অধীনে রাখা যাবে না তখন তারা উপমহাদেশকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত করে স্বাধীনতা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারই ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। বৃটিশ শাসকগণ ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে তাদের বহুল আলোচিত ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতির প্রয়োগ করেন। তারা এমনভাবে ভারত ভাগ করেন যেনো এই উপমহাদেশে কখনোই শান্তি স্থাপিত হতে না পারে। তাদের সেই উদ্দেশ্য শতভাগ সফল হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তানে যোগদান করে। তারা ভেবেছিলেন, ধর্মীয় ঐক্য/সাযুজ্যের কারণে পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রে বাংলাদেশের মানুষ স্বীয় মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে পারবে এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক শ্রেণি মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তি লাভ করবে।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভুল ভাঙতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়নি। পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর প্রথমেই আঘাত আসে বাংলাদেশের মানুষের মাতৃভাষায় উপর। পাকিস্তানি শাসকচক্র ঘোষণা করেন,উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

বাংলাদেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে থাকে। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে ১৯৪৮ সালে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের এক ধরনের সমঝোতা চুক্তি হয় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য। কিন্তু পাকিস্তানে শাসক চক্র পরবর্তীতে সেই চুক্তি অগ্রাহ্য করে পুনরায় ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশের দাবি উপেক্ষা করা হয়। এর ফলে মানুষ বিক্ষোভে ফেঁটে পড়ে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট অধিবেশন চলাকালে আন্দোলনকারী ছাত্ররা পার্লামেন্ট ভবন ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি এবং সব ধরনের আন্দোলন- সংগ্রাম নিষিদ্ধ করে। ছাত্ররা সেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে আসে। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে হত্যা করে। ভাষা আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে পাকিস্তানি শাসক চক্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান তাদের জন্য নিরাপদ নয়। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলে মানুষ যত আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে তার পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতা অর্জনের পুরো কৃতিত্ব তার একার নয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে স্বাধীনতার পুরো কৃতিত্ব এক ব্যক্তি ও একটি পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়। শুধু তাই নয়, কল্পিত একক কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠার নামে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সেনানিদের চরিত্র হননের প্রচেষ্টাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিশেষ করে স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কৃতিত্বকে ম্লান করার কতই না চেষ্টা চলেছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে পাকিস্তানের চর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেই জিয়াউর রহমানকে ‘বীর উত্তম’ খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। প্রতিপক্ষকে সম্মান না জানালে নিজেও সম্মানিত হওয়া যায় না, সম্মান পাওয়া যায় না।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিব পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার বরণ করেন। পৃথিবীর কোনো দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি নেই যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা যুদ্ধ ক্ষেত্রে না গিয়ে শত্রুর হাতে গ্রেপ্তার বরণ করেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার বরণ করায় স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত পুরো জাতি হতাশ এবং বিহ্বল হয়ে পড়ে। তারা দিকনির্দেশনা পাচ্ছিলেন না তাদের করণীয় সম্পর্কে। এমন সময় ২৬ ও ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে নিজের নামে এবং পরবর্তীতে শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আমি এর মাত্র কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছি। সেই সময় আন্দোলন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ ছিল। আমি নিজ শহর ফেনীতে চলে যাই। সেখানেই আমি রেডিও মারফতে দেওয়া মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পাই। জিয়াউর রহমানকে আমি আগে থেকে চিনতাম না। একজন মেজরের কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনে আমি যারপর নাই উজ্জীবিত হই এবং তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য। মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শ্রবণ করে আমার মাঝে কী অনুভূতি হয়েছিল তা কখনো বর্ণনা করা আমরা পক্ষে সম্ভব নয়। যারা মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, তারা কী একবারও ভেবে দেখেছন, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হতো এবং মেজর জিয়া যদি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হতেন তাহলে তার কী পরিণতি হতো? তাকে নিশ্চিতভাবে ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দিতে হতো। নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও মেজর জিয়া সেদিন দেশ মাতৃকার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের পরিবার স্বাধীনতার একক কৃতিত্ব দাবি করে থাকে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে শেখ মুজিবকে দেবতার আসনে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠনে শেখ মুজিবের অবদান কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। তাই বলে তিনি না থাকলে স্বাধীনতা অর্জিত হতো না এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কারো একার জন্য স্বাধীনতা যেমন অর্জিত হয় না, তেমনি কারো জন্য স্বাধীনতা ঠেকে থাকে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যার যতটুকু অবদান তার স্বীকৃতি দিতেই হবে। শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ রাতে আত্মগোপনে না গিয়ে হানাদার বাহিনীর হাতে কেন গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন তা এখনো রহস্যে ঘেরা। একজন আন্দোলনকারী নেতা হিসেবে শেখ মুজিব সফল হলেও শাসক হিসেবে তিনি চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তার আমলেই বাংলাদেশের ব্যাপক মাত্রায় দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। শেখ মুজিব এক সময় দুঃখ করে বলেছিলেন, ‘সাবাই পায় স্বর্ণের খনি আর আমি পেয়েছি চোরের খনি। আমি বিদেশ থেকে সাহায্য চেয়ে আনি আর চাটার দল সব খেয়ে ফেলে।’ স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা ছিল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ যদি এককভাবে সরকার গঠন না করে জাতীয় সরকার গঠন করতো তাহলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু সেটা না করার ফলে জাতি বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাসদ এবং আরও কোনো কোনো রাজনৈতিক দল সশস্ত্র পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। ফলে সারা দেশব্যাপী নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। দলীয় কর্মীদের ব্যাপক লুটপাটের কারণে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭৪ সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। পরবর্তীতে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ তাদের গবেষণা প্রমাণ করেছেন,সেই সময় দেশে খাদ্যাভাব ছিল ঠিকই তবে তা এমন পর্যায়ে নয় যার কারণে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতে পারে। খাদ্যভাব নয় খাদ্য সুষম বণ্টনের অভাবেই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আওয়ামী লীগের স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা ব্যাপক লুটপাট চালায়। চোরাই পথে খাদ্য শস্য বিদেশে পাচার করতে থাকে।

আওয়ামী লীগ নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী হিসেবে জাহির করে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আওয়ামী লীগ শাসনামলেই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল দু’টি। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে সরকার গঠন অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অংশিদারিত্ব নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত,অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে সবার জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের হাতে যদি শাসন ক্ষমতা অর্পন করা হতো তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রয়োজন হতো? পাকিস্তানি শাসক চক্র যদি সেদিন গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারতো। একইভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন’ শীর্ষক যে প্রচার পত্র প্রকাশ করা হয় তাতে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিষয়টি জানতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের শাসনামলে দেশে ব্যাপক লুটপাট শুরু হয়। রাজনৈতিক পরিচয়ে একটি মহল দেশের সম্পদ লুটে নিতে থাকে। সাধারণ মানুষ হয় উপেক্ষিত। গিনি সহগ এর তথ্য মতে, স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২-১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থায় বিত্তবান ও বিত্তহীনের মাঝে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অনেকটাই সহনীয় পর্যায়ে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এসে অর্থনৈতিক বৈষম্য মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব মতে, ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে মোট জাতীয় আয়ে শীর্ষ ১০শতাংশ ধনী ব্যক্তির অংশ ছিল ২৮ শতাংশ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১ শতাংশে উন্নীত হয়। একই সময়ে প্রান্তিক মানুষের আয় কমে তারা প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করা শুরু হয় ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে। সেই সময় নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রভাব, পেশি শক্তির ব্যবহার, জাল ভোট প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করা হয়। সেই প্রবণতা থেকে পরবর্তীতে আর উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক সরকারের অধীনে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার কোনোটিই সুষ্ঠু এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮ এবং ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। লক্ষণীয়, নির্দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত কোনো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক দল পরপর দু’বার ক্ষমতাসীন হতে পারেনি। তার অর্থ হচ্ছে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন তারা কেউই জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। আওয়ামী লীগ সরকারে আমলে ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ প্রহসনমূলক। এসব নির্বাচন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যূনতম গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ যদি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থাকে এভাবে ধ্বংস করে না দিতো তাহলে তাদের হয়তো এমন করুণভাবে ক্ষমতাচ্যুৎ হতে হতো না। জনগণের অধিকার হরণ করার কী পরিণতি হতে পারে তা আওয়ামী লীগ হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে বিএনপি নেত্রী তিনবারের নির্বাচিত সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং তার পরিবারের প্রতি যে প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে বাধ্যতামূলকভাবে ১৭ বছর যুক্তরাজ্যে নির্বাসিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। তার উপরও চালানো হয়েছিল নির্মম নির্যাতন। বেগম খালেদা জিয়া ও তার পরিবারের উপর সরকার যতই নির্যাতন চালিয়েছে তার জনপ্রিয়তা ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএনপি এবং বেগম খালেদা জিয়ার পরিবারের প্রতি সাধারণ মানুষের এই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করা গেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে জনগণ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিএনপি প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে।

দীর্ঘদিনের আওয়ামী দুঃশাসন থেকে মুক্তির জন্য ছাত্র-জনতা মাঠে নেমে আসে। প্রচন্ড আন্দোলনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি দিন। কিন্তু তাই বলে ৫ আগস্ট কোনোভাবেই স্বাধীনতার দিবস বা ১৯৭১ সালের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ হতে পারে না। কারণ একাত্তর সালে আমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। আর চব্বিশের জুলাই-আগস্ট আমরা অভ্যন্তরীণ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিজয়ী হয়েছি। উভয় ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ তবে কেউ কারো প্রতিস্থাপক নয়।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রশংসিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বিএনপি জোট সরকার গঠন করেছে। এক ভিন্ন প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়েছে নতুন সরকার। নির্বাচনকালে বিএনপি জোট বেশ কিছু অঙ্গীকার করেছে। এখন চলছে সেই অঙ্গীকার পূরণের পালা। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই একের পর এক চমক সৃষ্টি করে চলেছেন। বাংলা একাডেমির একুশে বই মেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও আলোকিত মানুষ গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

নতুন সরকার নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জটিল সমস্যা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছেন। এসব সমস্যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। সংঘাতময় বিশ্ব পরিস্থিতি সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে। গত প্রায় ৪ বছর ধরে দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়নি। উচ্চ

মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। নতুন সরকার যখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা চিন্তা-ভাবনা করছে ঠিক তখনই শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ। ইতোমধ্যেই মূল্যস্ফীতির হার ৯ দশমিক ১৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। যুদ্ধের কারণে ইরান হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেলবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিদিন বিশ্বব্যাপী যে জ্বালানি পরিবহণ করা হয় তার ২০ শতাংশই হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায়। ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ব্যারেল প্রতি অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্য কয়েক দিনের মধ্যেই ৬৫ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১০০ মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে আগামী তিন চার মাসের মধ্যে জ্বালানি তেলের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। এই মুহূর্তে জাতির সঙ্কটকালে আমাদের প্রত্যেকেরই জ্বালানি তেল ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী হতে হবে। আমি মনে করি,এ সঙ্কটকালীন সময়ে আমাদের জাগতিক কৃচ্ছতা সাধনে মনযোগী হতে হবে। সঙ্কটকালে যুগে যুগে পৃথিবীতে মানব জাতির কৃচ্ছতা সাধনের (Worldly Asceticism) বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব,এই সঙ্কটকালে আমাদেরকেও কৃচ্ছতা সাধনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমরা বীরের জাতি। আমারা কোনো কিছুকে ভয় পাই না। একজন আশাবাদী মানুষ হিসেবে বিশ্বাস করি, আমরাসহ বিশ্ববাসী এই সঙ্কট উত্তরণে সক্ষম হব।

যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম মূলত মধ্যপ্রাচ্যের ৬টি মুসলিম দেশ কেন্দ্রিক। যুদ্ধের কারণে ৭০ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি তাদের চাকরি হারানোর শঙ্কায় রয়েছেন।

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সামনে অনেকগুলো জটিল সমস্যা উপস্থিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে বিজয়ী হয়েছিলাম ঠিক একইভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপস্থিত সকল সঙ্কট মোকাবিলা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশিরা কখনোই হার মানতে পারে না। এবারের স্বাধীনতা দিবসের অঙ্গীকার হোক ঐক্যবদ্ধভাবে সঙ্কট মোকাবিলার। ❑

লেখক: সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।

মহান শহিদদের স্মরণ করি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে

নিম্নমানের শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নমানের গ্রাজুয়েটি সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্ন হলো এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? একটি উপায় হলো পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম অনুযায়ী উন্নতমানের পাঠ তৈরি করে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচার করা। এ কাজে এখন পর্যন্ত দেশে উন্নত মানের যেসব শিক্ষক রয়েছেন তাদেরকে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে জিডিপির ৫ শতাংশ ধাপে ধাপে ব্যয় করার জন্য লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত হয়ে যাবে এমনটি মনে করার কোনো কারণ নেই। শিক্ষায় গুণগত মান ধীরে ধীরে উন্নত হতে পারে যদি বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং রেডিও টেলিভিশনের ডেডিকেটেড চ্যানেল দিয়ে উন্নতমানের পাঠদান করা সম্ভব হয়। এছাড়া ভালো শিক্ষকদের পুরস্কৃত করে এবং জাতীয়ভাবে তাদের মুখচ্ছবি মিডিয়াতে তুলে ধরে যদি উৎসাহিত করা যায় তাহলে আমরা যথেষ্ট সুফল পেতে পারি। তবে এর জন্য সবচাইতে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সেই রাজনৈতিক অঙ্গীকার হতে হবে দল-মত-গোষ্ঠী নিরপেক্ষ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আমরা চরমভাবে পিছিয়ে আছি। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের জন্য উন্নতমানের গবেষণা করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি অনেক দূর এগিয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়। ব্যয়বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার কোন দিকটি কতটুকু প্রাধান্য পাবে সেটিও নিরূপণ করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষাখাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পর্যায়ের তুলনামূলক বরাদ্দ কী হবে, শিক্ষক উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ কী হবে, উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের জন্য বরাদ্দ কী হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য বরাদ্দ কী হবে, সমুদয় বিষয়গুলো সর্বাধিক উপযোগ সৃষ্টির নিরিখে নির্ণয় করতে হবে।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি সংস্কৃতি। বৈচিত্র্য ব্যাপকতা, গভীরতা ও মানবিকতার গুণে এই সংস্কৃতির জুড়ি নেই। আমাদের সংস্কৃতি আমাদেরকে বিদেশি আধিপত্যবাদ ও উপনিবেশবাদের

বিরুদ্ধে লড়াই করতে যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই দিক থেকে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারি আমাদের সংস্কৃতির বৈভব আমাদেরকে এক আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সংস্কৃতি যেমন একদিকে আত্মমর্যাদা অর্জনের হাতিয়ার হতে পারে আবার অন্যদিকে সংস্কৃতি হতে পারে আত্মমর্যাদার হারানোর অস্ত্র। বাংলাদেশ উত্তরকালে আমাদের সংস্কৃতি চর্চা ক্রমান্বয়ে একপেশে হয়ে উঠেছে ভিনদেশি আধিপত্যবাদকে প্রবল করে তোলার জন্য। সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয় আদান প্রদানের মাধ্যমে, অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে নয়। সেকারণে আমাদের সংস্কৃতি বিশেষ করে আমাদের শিল্প সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চারু ও কারুকলা এমনভাবে রূপায়িত হওয়া উচিত যাতে করে আমাদের আত্মমর্যাদা এবং আত্মপরিচয় বিধৃত হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে কর্মময় জীবনে সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ একদিকে যেমন কাজের সৌকর্য বৃদ্ধি করে অন্যদিকে তেমনি কর্মীকে করে তোলে উদ্যমী ও সৃজনশীল। জাতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতি চর্চাকে সমৃদ্ধ, জীবনবোধ সম্পন্ন ও জাতীয় মর্যাদার অনুগামী করে তোলার জন্য শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বৈরী মতাদর্শের আগ্রাসনে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলো তার স্বকীয়তা হারিয়েছে। এবারের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে দেশ গড়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আমরা এমন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেব যে আন্দোলন আমাদেরকে সচেতন করবে আমাদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে। আমাদের আত্মপরিচয় নিহিত আছে আমাদের ভাষা, ধর্ম, ভূগোল ও প্রাকৃতিক পরিবেশে। এগুলোর সঙ্গে সংগতি রেখেই আমাদের সংস্কৃতির স্বরূপ সৃষ্টি হওয়া উচিত। তাই জাতি হিসেবে আমরা রংধনু জাতি সৃষ্টি করার প্রত্যয় ঘোষণা করেছি। আমাদের মাতৃভূমিতে বসবাসরত সকল শ্রেণি, পেশা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয় নির্বিশেষে আমাদেরকে এমন এক সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করতে হবে যার মধ্য দিয়ে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং আত্মার বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারে। জাতি হিসেবে আমরা যেন একটি অপরাজেয় সুঠাম জাতিতে পরিণত হতে পারি তার জন্য আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ ব্যবহার করব। আমরা আত্মিক লাভবান হওয়ার জন্য আমাদের সংস্কৃতির মণি-মানিক্যগুলো থেকে যে আভা ঠিকরে পড়ে সেই আভায় যেন আমাদের নিজেদের ও বিশ্ববাসীকে চিনতে পারি।

এবারের ৫৬তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আমাদেরকে আত্মনুসন্ধানী হতে হবে। একদিকে যেমন আমরা জানান দেব কী করতে পেরেছি, অন্যদিকে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে কী করতে পারিনি। এ দুইয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে জাতি অতীতের দুঃখ-গ্লানি ও অপ্রাপ্তি থেকে মুক্ত হতে পারবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ২০২৪ এর জুলাই একটি চিরস্মরণীয় অধ্যায়। আমরা একদিকে যেমন একাত্তরের শহিদদের পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করব, একই সঙ্গে জুলাইয়ে যে শহিদরা জীবন বিসর্জন দিয়েছে ফ্যাসিবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য সেই শহিদদেরকেও আমরা আমাদের অন্তরের মণিকোঠায় ধারণ করব। গণতন্ত্র ও মুক্তির সংগ্রামী লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকলে জাতি হিসেবে আমরা কখনো বিপথগামী হব না। আজ ৫৬তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে প্রতি মুহূর্তে শহিদদের আত্মত্যাগের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। ❑

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়